‘ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়...’

প্রভাষ আমিন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ৯ মাসের। কিন্তু মুক্তির সংগ্রাম ২৩ বছরের। শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি পরে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন, তিনি একটি জাতিকে মুক্তির চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পরপরই বাংলার মানুষের স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছিল। তারা বুঝে গিয়েছিল ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর বাংলার মানুষ এবার পশ্চিমাদের পাল্লায় পড়েছে। পাকিস্তান গঠনের পরপরই শাসক দল মুসলিম লীগের গণবিরোধী রূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। মাত্র দুই বছরের মাথায় মুসলিম লীগের পাল্টা দল হিসেবে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ, মানে জনতার মুসলিম লীগ। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ পরিণত হয় আওয়ামী লীগে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের দলে। ক্রমে আওয়ামী লীগ হয়ে ওঠে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘর।

আর আওয়ামী লীগের বিকাশ ঘটে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। ৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দিলে ফুঁসে ওঠে বাঙালি। কার্যত সেদিন থেকেই তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমাদের শাসনের অবসান ঘটে। ৭ই মার্চ তখনকার রেসকোর্স ময়দানে (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অনেকে বিতর্ক করার চেষ্টা করেন। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেও আপামর জনতা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।

অনেকেই বলেন, বঙ্গবন্ধু কেন ৭ই মার্চই স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা দিলেন না। দেননি, কারণ বঙ্গবন্ধু জানতেন ৭ই মার্চ যুদ্ধের ঘোষণা দিলে পাকিস্তানিরা সেদিনই রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতো। তারচেয়ে বড় কথা একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চিহ্নিত হতো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে। আক্রান্ত হওয়ার পরেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। তাতে সারাবিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। মার্চের প্রথম দিন থেকেই তখনকার পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পশ্চিমারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক সমাধানের পথে হাঁটতে থাকে। তবে অস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশের জন্য আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করতে থাকে। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হায়েনারা ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর।

ধানমন্ডির ৩২ নাম্বারের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আগে যেমনটি বলেছি, আক্রান্ত হওয়ার পর গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু। অনেকে এও বলেন, বঙ্গবন্ধু অন্যদের সাথে পালিয়ে গেলেন না কেন? বাসায় থেকে গ্রেপ্তার হলেন কেন? বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি যারা অনুসরণ করেন, যারা তাঁর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়েছেন; তারা জানেন বঙ্গবন্ধু কখনো পালিয়ে যাওয়ার লোক নন। তিনি সবসময় মোকাবেলা করেছেন। পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস থাকলে বঙ্গবন্ধুকে জীবনের সোনালি সময়টা কারাগারে কাটাতে হতো না। বঙ্গবন্ধু কখনো গোপন রাজনীতি করেননি, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করেননি, কখনো বিপদে ভয় পাননি, পালিয়ে যাননি। এমনকি ৭৫এর ১৫ আগস্ট খুনিরা ধানমন্ডির বাসায় হামলার পর বঙ্গবন্ধু সেনাপ্রধান শফিউল্লাহকে ফোন করেছিলেন। শফিউল্লাহ বঙ্গবন্ধুকে পালানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ঘাতকের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছেন। জীবন দিয়েছেন, তবু পালাননি।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি কারামুক্ত বঙ্গবন্ধু সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে ২৬ মার্চ গ্রেপ্তার হওয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘আমি ভেবেছিলাম, আমাকে পেলে ওরা আমার হতভাগ্য মানুষদের হত্যা করবে না। আমি জানতাম, তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে। আমি তাদের বলেছিলাম, প্রতি ইঞ্চিতে তোমরা লড়াই করবে। আমি তাদের বলেছিলাম, হয়তো এটাই আমার শেষ নির্দেশ। কিন্তু মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই তাদের করতে হবে।’ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ দেশের মানুষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। প্রতিটি ইঞ্চিতে লড়াই হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করেই গঠিত হয় প্রবাসী সরকার। বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা সামনে রেখে, তাঁর নির্দেশ মেনেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে।

ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তারের পর সামরিক জিপে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। সেই রাতে তাঁকে আটক রাখা হয় তৎকালীন আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল, বর্তমান শহীদ আনোয়ার উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে। পরদিন তাঁকে নেওয়া হয় ফ্ল্যাগস্টাফ হাউসে, সেখান থেকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বিমানে করাচি নেওয়া হয়। করাচি বিমানবন্দরে পেছনে দাঁড়ানো দুই পুলিশ কর্মকর্তার সামনের আসনে বসা বঙ্গবন্ধুর ছবি পরদিন সব দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়। পাকিস্তানে নেওয়ার পর কোথায় বঙ্গবন্ধুকে আটক রাখা হয়েছে, তাঁকে নিয়ে কী করা হবে, এসব বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে। করাচি থেকে কঠোর গোপনীয়তায় বঙ্গবন্ধুকে নেওয়া হয় লাহোরের ৮০ মাইল দূরের লায়ালপুর শহরের কারাগারে। একাধিক কেন্দ্রীয় কারাগার থাকার পরও বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুর শহরের জেলা কারাগারে নেওয়া হয়েছিল দুটি কারণে। প্রথমত বঙ্গবন্ধুকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে তার মনোবল ভেঙে দেওয়া। দ্বিতীয়ত লায়ালপুর ছিল পাকিস্তানের সবচেয়ে গরম এলাকা। নির্জন কারাকক্ষে প্রচণ্ড গরমে বঙ্গবন্ধুকে আটকে রাখাটা ছিল পরিকল্পিত, যাতে তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তোলা যায়।

অবশ্য বঙ্গবন্ধুকে কঠোর গোপনীয়তায় পাকিস্তানে এক জেলে আরেক জেলে নেওয়া হয়। পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। বাংলাদেশে যে যুদ্ধ হচ্ছে, তার কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি বঙ্গবন্ধুকে। পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে। যার সর্বোচ্চ সাজা ছিল মৃত্যুদণ্ড। এমনকি বঙ্গবন্ধুর জন্য কারাগারে কবরও খোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলের চাপে বঙ্গবন্ধু বেঁচে গিয়েছিলেন। এমনকি ১৬ ডিসেম্বর রাতে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়ে গেছে, তখনও বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এক শুভাকাঙ্ক্ষী কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুকে গোপন স্থানে নিয়ে তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন।

পাকিস্তানে কারাগারে থাকার কথা বঙ্গবন্ধু পরে বলেছেন। বড় কঠিন ছিল সেই দিনগুলো, "আজ আমি স্বাধীনতার অপরিসীম ও অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। এ মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। আমার জনগণ যখন আমাকে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রপতি' হিসেবে ঘোষণা করেছে তখন আমি 'রাষ্ট্রদ্রোহ'র দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে একটি নির্জন ও পরিত্যক্ত সেলে বন্দি জীবন কাটিয়েছি...। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে বিচারের নামে প্রহসন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শুনানি অর্ধেক সমাপ্ত হবার পর পাক কর্তৃপক্ষ আমার পক্ষ সমর্থনের জন্যে একজন আইনজীবী নিয়োগ করে। আমি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে 'বিশ্বাসঘাতক'-এর কলঙ্ক নিয়ে মৃত্যুদণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর, আমার বিচারের জন্যে যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল তার রায় কখনও প্রকাশ করা হবে না। সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিচারের নামে প্রহসন অনুষ্ঠান করে আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর ফন্দি এঁটেছিলেন। কিন্তু ভুট্টো এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে অস্বীকার করেন। জনাব ভুট্টো আমাকে না বলা পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। জেলখানা এলাকায় বিমান আক্রমণের জন্যে নিষ্প্রদীপ জারি করার পর আমি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কথা জানতে পারি। জেলখানায় আমাকে এক নিঃসঙ্গ ও নিকৃষ্টতম কামরায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল যেখানে আমাকে তারা কোনো রেডিও, কোনো চিঠিপত্র দেয় নাই। এমনকি বিশ্বের কোথায় কী ঘটছে, তা জানতে দেওয়া হয় নাই।"

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম হয় একটি নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। কিন্তু সে বিজয় পূর্ণতা পাচ্ছিল না। কারণ বিজয়ের মহানায়ক তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। ততদিনে পাকিস্তানেও পালাবদল ঘটে গেছে। ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো। আন্তর্জাতিক চাপে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে ২৯০ দিন বন্দী থাকার পর মুক্তি মেলে বাংলার মহানায়কের।

পাকিস্তান থেকে সরাসরি বাংলাদেশে আসেননি বঙ্গবন্ধু। লন্ডন ও দিল্লি হয়ে দেশে ফেরেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ভোররাতে মুক্তি দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুকে। মুক্তির পর ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। সেদিনই তিনি পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের বিশেষ ফ্লাইটে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হন। ওই দিন বাংলাদেশ সময় ১২টা ৩৬ মিনিট হিথরো বিমানবন্দরে পৌছান তিনি। লন্ডনে বিরল সম্মাননা দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুকে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ তার সরকারি সফর সংক্ষিপ্ত করে লন্ডনে ফিরে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানাতে। ৮ জানুয়ারি বিকেল ৫টায় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। যাবতীয় রীতি উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধুকে বহন করা গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন যতক্ষণ না বঙ্গবন্ধু গাড়িতে ওঠেন। অথচ তখনও যুক্তরাজ্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতিও দেয়নি। লন্ডনে ক্ল্যারিজ হোটেলে সংবাদ সম্মেলনও করেন বঙ্গবন্ধু। লন্ডন থেকে ১০ জানুয়ারি সকালেই তিনি নামেন দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। দিল্লীতেও বঙ্গবন্ধুকে নজিরবিহীন সংবর্ধনা দেয়া হয়।

৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবরে বাংলাদেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সন্ধ্যা থেকে সারারাত মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেল-স্টেনগানের ফাঁকা আওয়াজ করে আনন্দ-উল্লাস করেছিল। রাস্তায় নেমে এসেছিল লাখো মানুষ। ৮ জানুয়ারি থেকেই অপেক্ষা কখন আসবেন বীর, কখন নামবেন মহানায়ক। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দিনটি ছিল অন্যরকম। দিনটি ছিল রোদমাখা ঝলমলে দিন। বাতাসেও ছড়িয়ে পড়েছিল আনন্দ। রেসকোর্স ময়দানসহ গোটা শহরে আসলে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল আনন্দের বারতা - ফিরছেন বঙ্গবন্ধু, আমাদের মহানায়ক। দিল্লি থেকে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করে। ঢাকার আকাশসীমায় পৌছানোর পরে অপেক্ষারত জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। বেলা ১টা ৫১ মিনিটে ঢাকা বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণ করে। বিমানে সিঁড়ি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ নেতারা ছুটে যান প্রিয় বঙ্গবন্ধুর কাছে। বিমান থেকে নেমে ধীর পায়ে নেমে এলেন হাজার বছরের সেরা বাঙালি বঙ্গবন্ধু।

তেজগাও থেকে রেসকোর্স - পুরো রাস্তাই লোকারণ্য। বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দানে পৌছাতে লেগেছিল তার দীর্ঘ সময়। বাড়িতে প্রিয়জনদের কাছে নয়, বঙ্গবন্ধু ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় মানুষের কাছে। যে রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চের ঘোষণায় স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১০ মাস পর সেই রেসকোর্সেই ফিরে এলেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে। আবেগাপ্লুত বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আজ আমি বাংলায় ফিরে এসেছি বাংলার ভাইয়েদের কাছে, মায়েদের কাছে, বোনদের কাছে। বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।' ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পূর্ণতা পেলো বাংলাদেশের বিজয়।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আয়োজনটি সম্প্রচার করছিল আকাশবাণী। কণ্ঠে আবেগ নিয়ে প্রতিটি মুহূর্তের ধারাবিবরণী দিচ্ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসা নিয়ে আবিদুর রহমান একটি গান লিখেছিলেন। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে অসাধারণ সেই গানটি গেয়েছিলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়:

'বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায় তুমি আজ
ঘরে ঘরে এত খুশি তাই।
কী ভালো তোমাকে বাসি আমরা, বলো কী করে বোঝাই।
এদেশকে বলো তুমি বলো কেন এত ভালোবাসলে,
সাত কোটি মানুষের হৃদয়ের এত কাছে কেন আসলে,
এমন আপন আজ বাংলায়... তুমি ছাড়া কেউ আর নাই
বলো, কী করে বোঝাই।
সারাটি জীবন তুমি নিজে শুধু জেলে জেলে থাকলে
আর তবু স্বপ্নের সুখি এক বাংলার ছবি শুধু আঁকলে
তোমার নিজের সুখ-সম্ভার কিছু আর দেখলে না তাই
বলো কী করে বোঝাই।'

আকাশবাণীর সেদিনের আয়োজনে একটু পরপরই একটি রবীন্দ্রসংগীত বাজছিল, 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।' রবীন্দ্রনাথ যেন গানটি বঙ্গবন্ধুর জন্যই লিখেছিলেন।